‘টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম’

প্রশান্ত মাজী

তখন গড়িয়াহাট রোডে নামছে সন্ধ্যা।

একে একে জ্বলে উঠছে দশতলা থেকে দোকানঘরের, হকার্স কর্নারের আলো। শাঁখের আওয়াজ না শোনা গেলেও বিকেল শেষের এই অদ্ভুত আঁধারকে স্বাগত জানাতে নিশ্চয়ই সবাই প্রস্তুত। কেননা এসময়েই ন’দিরা চুল বাঁধে, ছোটকাকীমারা সারাদিনের ক্লান্তি মুছে নেয় গা ধুয়ে, দ্রুত প্রসাধন সেরে ছোড়’দি-রা হারমনিয়মে বসে, সাদা-কালো রিডে তাদের আঙুল ঘোরাফেরা করে ‘আমার বেলা যে যায়…।’ গাছপালা নেই— কলকাতার অভিজাত পাড়া— তাই পাখিদের বাসা-দখল নিয়ে কিচিরমিচির শোনা না গেলেও, বারান্দায় বসে তাদের কিছু দলবদ্ধ উড়ে যাওয়া দেখেছি।

ঠিক এরকম এক শান্ত, নিঝুম সময়ে আমরা, মানে আমি আর কবি ভাস্কর চক্রবর্তী বসে আছি, এই তো ক’দিন আগেই ‘মেঘমল্লার’-এর একফালি বারান্দায়। আমাদের মুখোমুখি সেই কবি, উৎপলকুমার বসু।

‘এই, আমাদের খেতে দাও!’ বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। হয়ত এখুনি আমাদের ছাদে

যেতে বলবেন, সবে-নেমে-আসা সন্ধ্যার ছাদে দাঁড়িয়ে, আকাশে তাকিয়ে হয়ত বলে উঠতে পারেন সহসা, তাঁর কবিতার মতোই, 'ও মা ! এরা সব একে একে হাজির দেখছি ! কী কাণ্ড !'*

আমাদের মাথার উপরে তখন এক-আকাশ নক্ষত্রের দ্যুত, টপাটপ্ নেমে আসা শুরু হয়ে গেছে নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে।

উৎপল থেমে থেমে সেদিন অনেক কথাই বলছিলেন— বাঙলার কথা, বাঙালির কথা, কোন্ কোন্ বুদ্ধিজীবী মুখ খুললেই (বক্তব্য ঠিক বা ভুল যাই হোক) তাঁদের বিরোধিতা করা দরকার— এইসব অনেক প্রস্তাব ও অনুধাবন। তার মাঝে মাঝে পদান্বয়ী অব্যয়ের মতো সব কিছুকে গেঁথে দিচ্ছিলেন তাই দিয়ে— যা কবিতা।

'...আজকাল কেবলই নানা লোকের গলা শুনতে পাই, হ্যাঁ, শুধু ভয়েস— কবেকার শোনা কণ্ঠস্বর— একেবারে অবিকল মনে পড়ে...।' তৎক্ষণাৎ আমাদেরও মনে পড়ে যায় তাঁর সাম্প্রতিকতম গদ্যগ্রন্থ 'ধূসর আতাগাছ' উৎসর্গ করা হয়েছে সেই ভয়েসকেই, "ছেলেবেলায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে, বহু ঘুমহীন রাতে শুনেছি চৌকিদার হেঁকে যাচ্ছে 'বস্তিওয়ালে জাগো... কোঠিওয়ালে জাগো...।' সেই অজানা, অদেখা, সাবধানকারী, নিশাচর মানুষটির প্রতি আমার এই অস্থিরমতি লেখা কালস্রোতে ভাসিয়ে দিলাম।"

তাঁর কবিতাও তো তাই। কিছু ভয়েস, কিছু ভ্রমণ, কিছু প্রকৃতির হেঁসেল, কিছু ছবি— রঙীন পাথর সব— আর কাঁচের টুকরোর ক্যালিডোস্কোপের খেলা। যত ঘোরাবে তত নিত্য নতুন নক্সা তৈরি হয়ে আসবে।

'হয়ত তাই। তবে কী জানেন, কবিতা লেখার কথা কি ছিল আমার ? মনে তো হয় না। ছেলেবেলায় ভালো লাগত হাতের কাজ— ক্র্যাফট্ ! বাড়িতে সবাই সুযোগ পেলেই বসিয়ে দিত ঐসব কাজে— জুতো পালিশ, নক্সাকাটা, কাগজকাটা, রঙ করা, সাইকেল মেরামতি, বাঁধনে সুতো পরানো। ভালোও লাগত আমার।

'তারপর একদিন সহসা কবিতা এল। কেন, কীভাবে এখনও বলা মুশকিল।'

হয়ত মুশকিল বলা, তবু 'কবিতা লেখা যে চমৎকার', তাঁর কাছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে কই, আর কবিতা কী তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন নানা সময়ে, নানা ভঙ্গিতে :

১. কবিতা ম্যাজিক মাত্র। এবং রসায়ণ। এবং দক্ষতা। আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হ'তে হবে।

২. আমাদের আরো ধূর্ত হ'তে হবে, হ'তে হবে অবহিত এবং জ্ঞানী। আমাদের জানতে হবে প্রযুক্তি বিদ্যা— কেন কবিতা লেখা হয়, না লিখলে কী হয়, সম্প্রসারণশীল হতে হবে আমাদের অতীত এবং ভবিষ্যতের উভয়প্রান্তে, আমাদের সম্প্রসারণশীল যাতায়াত পেতে হবে। আন্তরিক হ'তে হবে না আমাদের। কেন না আজ অব্দি কেউ বলতে পারেনি কেন অমুক কবি আন্তরিক এবং অমুক কবি নন।

* 'পঁচিশটি কবিতা' অংশের কুড়ি সংখ্যক কবিতাটি দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

৩. ছন্দ, প্রকৃতি, শব্দ, প্রেম, প্রচেষ্টা, প্রজনন, যুক্তি, অযৌক্তিকতা ইত্যাদি বাহাত্তোটা তাস একসঙ্গে যেন আমরা মেলে ধরতে পারি এবং গুটিয়ে নিতে পারি তৎক্ষণাৎ।

প্রয়াত সুব্রত চক্রবর্তী একবার উৎপলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'তাসের প্যাকেটে তো তাস থাকে ৫৪টি। আপনি ৫২ তাসের খেলা বললেন কেন? বাকী দু'টি জোকার ব'লে?'

'হ্যাঁ, তারা তো অংশগ্রহণ করে না খেলায়, আমার চাই প্রকৃত খেলোয়াড়কে। বাকী দু'জন এমনকি কোনভাবে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হওয়া থাকে না, তাদের কাজ প্যাকেটের শোভা বর্ধন করা, প্রকৃতই মজা হয়ে থেকে যাওয়া। আমার তাদের প্রয়োজন নেই— '...না হয় মফস্বলে সামুদ্রিক মাছের সম্পাদনা তুমি কোরো। আমার ঘোড়াটি চাই।" সুব্রত চক্রবর্তীর কথা যখন উঠলই, এই সুযোগে উদ্ধৃত করি তাঁর দু'একটি মন্তব্য। অবশ্যই উৎপল সম্পর্কে।

'নিজের কবিতার মতই রহস্যময় তিনি, আন্‌প্রেডিক্‌টেবল্‌। গ্রিক রূপকথার অ্যান্টিয়ুস যেন, তেমনই উজ্জ্বল ও সরল ও গ্লানিহীন— কথাবার্তা ও চালচলনে স্মার্ট ও চমৎকার আধুনিক, কিছুটা বে'টে, ভারি ঠোঁটের ভাঁজে প্রচ্ছন্ন চালাকি, গাঢ়-খর চোখ, আপাত-অবিন্যস্ত চুল, 'কিছুটা খয়েরি'।' ঠিক এইভাবে উৎপল সম্পর্কে আমাদের তিনি জানিয়েছিলেন, লিখেওছিলেন 'প্রতিকিব'-য় আজ থেকে আঠারো বছর আগে। যখন উৎপল পাকাপাকিভাবে ওদেশে আছেন কিন্তু মাঝে মাঝেই বলে যাচ্ছেন এখানে এসে 'দেখি, এর পরের বার এসে আর নাও ফিরতে পারি।'...

সুব্রতও তাঁর বর্ধমান শহরের ৩, ইছলাবাদ কলোনিতে বসে নিত্য বলতেন, 'একটু নুয়ে পড়েছ, বুঝলি!' আর বোঝাতেন কীভাবে উৎপলের কাছে কবিতা-লেখা প্লেজার, কেন উৎপল বাংলা কবিতার টারবুলেন্ট ফিফ্‌টিজ্‌-এর অন্যতম প্রধান কবি, কেন কীভাবে তিনি স্বপ্নতাড়িত, ইমেজিস্ট, চতুর, চেতনা-নিশ্চেতনায় সাবলীল ভ্রমণকারী ও বারোক কারুশিল্পে ভরা এক অভিনব ধরনের রহস্যময় বাংলা কবিতায় বিপ্লবী পথিকৃৎ। শুধুই কি বোঝাতেন, তার সঙ্গে যে কাণ্ডটি করতেন সুব্রত, তা বললে এখন আর কেউ বিশ্বাস করবেন না, কেননা 'এখন সবই অলীক'। তবু এই সুযোগে আমাকে তা বলতে হবেই, কেননা আমি কিছু বানিয়ে বা বাড়িয়ে বলছি না। তখনও পর্যন্ত উৎপলের মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, 'চৈত্রে রচিত কবিতা' আর 'পুরী সিরিজ'। তার মধ্যে 'পুরী সিরিজ' তখনই মিথ, গুপ্তপুথি, কোথাও পাওয়া যায় না, পড়া তো দূরের কথা, হাতে নিয়ে দেখাও একটা সৌভাগ্য। এসব শুনে আমরা নাছোড়বান্দা। 'পুরী সিরিজ' পড়তে দিন আমাদের। সুব্রত ধীর পায়ে হেঁটে যেতেন তাঁর বাড়ির শোবার ঘরের একমাত্র গোদরেজ আলমারিটির দিকে, বসবার ঘরে বইভর্তি কাঠের শেলফটির দিকে নয়। একের পর এক চাবি ঘুরিয়ে খুলে যাচ্ছেন পাল্লা, রত্নগুহার সামনে যেন তিনি আলিবাবা— তারপর দেখতে পেতাম আমরা, সেই লকার যার নরম

লাল ভেলভেটের বাক্সে স্ত্রীর গহনা, পাশে সোনার চেয়েও বেশি দামি এক খণ্ড 'পুরী সিরিজ'। আমাদের অনুমতি ছিল ওখানে বসে পড়ার, তাও খুবই সন্তর্পণে। হলুদ হয়ে-যাওয়া পাতার সেই ধ্বসর, কৃশকায় বইটির নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লীর ভেতর থেকে এখনও যেন স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আসে— '...সবুজ রহস্যময় আত্মা, তুমি বাছা, চাও নাকি সশব্দ প্রস্থান, তৃণ বেহালার মতো...' বা '...হে সূর্য, আলোক বিন্দু; একই সঙ্গে প্রসারিত করো তোমার জ্যোতির থাবা— ক্ষুধা ও চুম্বন'।

সুব্রতর লেখা 'উৎপলকুমার বসু ও তাঁর কয়েকটি কবিতা'— প্রকাশিত হল আমার সম্পাদনায়, 'প্রতিবিম্ব'য়। সংখ্যাটি নিয়ে গেছি ৭১, কাশীনাথ দত্ত রোডে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। মনে আছে সেই দুপুর— যখন আমারও সন্দীপনেরই মতো বেলা তিনটেতেও অফিস গেলে দিব্যি চলে যেত। সুব্রত, তাঁর লেখার শেষে, পাঠকের অবধানের জন্য উৎপলের কয়েকটি কবিতা আস্ত ছাপতে দিয়েছিলেন। তৃতীয় কবিতাটি ছিল :

ন্যূনতম কবিতা/৫

প্রিয় হে সবুজ ফল
তোমাকে কঠিন হতে
দেব না, সবুজ ফল
আমাদের স্বীয়
ভবিষ্যতে দেখা হবে
সেরকম কথা নেই। আজ
নিশীথের মতো দূরে
সূর্য ও আঁধার
একই সঙ্গে দেখা যায়
যেন উপাসনা ভেঙে দিয়ে
ডেকে ওঠে কাক, প্রিয় সর্বস্বতার
কিছু আজ পড়ে নেই
শৃঙ্খল ছাড়া, ঐ
অস্থিগুলি ছাড়া আজ
কিছু আর পড়ে নেই
ফল প্রিয় হে সবুজ তুমি
কীটে নষ্ট হও তবু তোমাকে
কঠিন হতে দেব না আমার
প্রতারণা এই।

কথা হচ্ছিল আমাদের, সন্দীপনের সঙ্গে, উৎপলের কবিতা নিয়ে, তাঁর চলে-যাওয়া বা আবার ফিরে-আসা নিয়ে। হঠাৎ সন্দীপন একটি প্রস্তাব ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে

যা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে উৎপলের কবিতার কীরকম পাঠক তিনি ছিলেন বা আজও আছেন।

সন্দীপন সহসা বলে উঠলেন 'আমরা দুজনেই এই কবিতাটি বেশ মন দিয়ে একবার, মাত্র একবারই পড়ব, তারপর দু'জনেই স্মৃতি থেকে তা বলার বা আবৃত্তির চেষ্টা করব, পুরোটা। দেখি তো, কে জেতে, কে হারে'। হঠাৎ এরকম প্রস্তাব কেন তা বুঝে ওঠার আগেই আমরা দু'জনেই শুরু করি সেই কবিতা নিয়ে খেলা— 'প্রিয় হে, সবুজ ফল…'।

বলা বাহুল্য, সেদিন সন্দীপন জিতেছিলেন। কোনো চালাকি নয়, অকারণ স্মার্টনেস নয়, সম্পূর্ণভাবে কবিতার বা উৎপলের কবিতার আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ সন্দীপন, সদ্য কবিতা-পাঠে-অভ্যস্ত আমাকে যথার্থ কারণেই হারিয়ে দিয়েছিলেন। '…যেন উপাসনা ভেঙে দিয়ে ডেকে ওঠে কাক…' পর্যন্ত ব'লে আমি যখন হোঁচট খেলাম, সন্দীপন শুরু করলেন, যেন স্তোত্র-পাঠ করবেন সমবেত ভক্তবৃন্দের সামনে, শেষও করলেন এমন ভাবে যে হাততালি দেওয়ার কথাও তখন আমি ভুলে গেছি। তাঁর সেই থেমে থেমে 'প্রিয়, সর্বস্বতার কিছু আজ প'ড়ে নেই, শৃঙ্খল ছাড়া…' বরানগরের ভর-দুপুরে, চারদিক শুনশানের মাঝে বসে যাওয়া গলায় সন্দীপনের আস্ত কবিতাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বলে যাওয়া আজও চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। ও'দের বাড়ির বারান্দায় তখন কিচির-মিচির করত নানা রঙের পাখিগুলো, পাশের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসত 'নন্ এসেন্সিয়াল সাউন্ডস্ যন্তো সব'।

সন্দীপন সবে লিখে উঠেছেন 'এখন আমার কোন অসুখ নেই'।

আসলে সন্দীপনের সেই সময়ের লেখা ও পোলেমিক এবং উৎপলের কবিতা সব একে অপরের পরিপূরক ছিল। 'কবিদের সঙ্গে মিশেই আমি লেখা শুরু করি'—সন্দীপনকৃত উৎপলের কবিতার ব্যাখ্যা পড়লেই তা টের পাওয়া যায়। সব মিলেমিশে একাকার। কমলকুমার মজুমদারের চিঠি নিয়ে 'মিনিবুক' বেরুবে। রঘুনাথ গোস্বামীকে সন্দীপন বলছেন, 'কভারে একটা পুরনো দিনের কারুকার্যময় ফ্রেম ক'রে দেবেন? ছবির জায়গাটা ফাঁকা রেখে দেব, কমলদা নেই, শুধু ফ্রেম…পাতা ওল্টালেই উৎপলের কবিতা '…সীতা ক্রোধে জলকুজ্ঝটির দিকে তাকিয়ে আছেন।/রাম তাঁকে বোঝাচ্ছেন এই জল, ফোয়ারা, তূণীর…/ পম্পাসরোবর তীরে মৃণালের আধো অবশেষ / ফেলেছে বানর। আরো অতিরিক্ত স্থির/অস্থি পড়ে আছে বনে…'। ওভাবেই মিনিবুক বেরিয়েছিল, তবে শেষপর্যন্ত সেই কারুকার্যময় ফ্রেমের মাঝে ছিলেন কমলকুমার।

কোন্ পত্রিকায় নিচের লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে তা অপ্রাসঙ্গিক, '…দূরে থেকে হাত তোলো। যদি পারো জানাও সম্মতি / নইলে সঙ্কেত আজো বৃথা যায়। চলে যায় নৈশ ট্রেন দূরে। অর্ধেক জাগ্রত রেখে আমাদের। অবিরত যাত্রা কি কাঠের?'— এই সেদিনও এক দৈনিক সংবাদপত্রে, উৎপলের এই বিখ্যাত কবিতার ব্যাখ্যা সন্দীপন সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে করেছেন— যেন আস্ত একটা ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটে গেছে,

কতদিন আগে, ক্রাচ বগলে মুহূর্তপর্বের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একমাত্র সারভাইভার, যে ঘটনাস্থলে বারবার আসে ও সেখানে সেই ভয়াবহ ধ্বংসকে প্রতিভাত করে তোলে।

সেদিন, সেই কবিতা-খেলার দুপুরেই, সন্দীপন আমার হাতে তুলে দেন উৎপলের প্রবাসজীবনে তাঁকে লেখা বড়সড় চিঠিগুলি।

'প্রতিবিম্ব'র ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশিত হয় 'উৎপলকুমার বসু অবশেষে ফিরে আসছেন' শিরোনামে।

বলা বাহুল্য, প্রায় প্রত্যেকটি চিঠিতেই উৎপলের এদেশে ফিরে পাকাপাকিভাবে থাকার পরিকল্পনা দানা বাঁধছিল।

আমরা চিঠিগুলি প্রকাশ করেছিলাম তাঁকে এদেশে স্বাগত জানিয়ে, জীবনানন্দের কবিতা দিয়ে— '...ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে, / ফিরে এসে প্রান্তরের পথে ; / যেইখানে ট্রেন এসে থামে / আম, নিম ঝাউএর জগতে / ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছো বুনন ; / আজো তারা শিশিরে নীরব.....'

সেইসব চিঠিতে উল্লেখ ছিল শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁর প্রবাসী মনের অবস্থা, একমাত্র ছেলে 'কাটু'র হুড়হুড় করে বেড়ে ওঠা বা মস্তিষ্ক দিয়ে বাজার করা, রান্না করা, টাইপ করা, গাড়ি মেরামত করার কথা— অর্থাৎ সহজতম রান্না সহজতম প্রযুক্তির পদ্ধতি খুঁজে বের করার কথা। আর ছিল কিছু আগাম ঘোষণা বা কিছু সতর্কবাণী :

১. বেশি মদ খাবেন না— সরকারের ট্যাক্স লাভ হয় (সন্দীপনকে)
২. আমি এদেশে একেবারেই ফিট করিনি— একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।
৩. লেখা ছাড়া কোন কাজে হাত দিতে চাই না।
৪. দেশে ফিরে আমার হাতে অনেক কাজ জমবে। এতবছর ধরে প্রচুর দৌড়োদৌড়ি করেছি। এবার শান্ত হয়ে বসা দরকার অন্তত কিছু দিনের জন্য।
৫. আমি ব্যক্তিগত ভাবে একটা বিরাট 'ম্যারাথন' দৌড়ের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। ... দীর্ঘদিন এদেশে বসবাস করার অভিজ্ঞতা মনের উপর গভীর ছাপ ফেলেছে। ছেলেবেলায় গিরিডিতে এক প্রবাসী বাঙালী বলেছিলেন— উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে যাচ্ছ যাও, কিন্তু বেশি বেলা কোরো না— ফেরার বাস নাও পেতে পার। বলা-বাহুল্য সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল— বাস পাওয়া যায়নি— অনেক রাতে একটা খালি, ভুতুড়ে ট্যাক্সি ধরে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম।
৬. এক আমেরিকান আর এক আমেরিকানকে একবার উপদেশ দিচ্ছে শুনেছিলাম : First make up your mind about what you want to do, then get someone to pay for it. আমরা এখনো হয়তো অতটা স্মার্ট নই।

১৯৭৮ থেকেই উৎপলকে দেখা যেতে লাগল কলকাতায়, কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে। হাসি, ঠাট্টা, মস্করা, বজ্জাতির মাঝে কখনও তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছেন, তরুণ

কবিদের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে বসে আছেন, দু' কাপ কফি নিয়ে ভাগাভাগি করে পাঁচজনে খাচ্ছেন আর নতুন কবিতার সন্ধান করছেন। লিখতেও শুরু করলেন। জ্যোতির্ময় সম্পাদিত 'কলকাতা' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন সাময়িকভাবে। তরুণ কবিদের বলছেন— চারদিকে তাকিয়ে দেখুন। কীভাবে ডাবওয়ালা কয়েকটা কোপে ডাব কাটছে তার ক্ষুরধার দা দিয়ে, বা কীভাবে অফিসযাত্রী ছুটে যাচ্ছে বাসস্টপের দিকে, দু' হাতে মুঠো-করে-ধরা খুচরো-পয়সা-ভর্তি পাঞ্জাবির ঝোলা-পকেট, বা বাসের পিছনের সিটে বসুন, কান খাড়া রাখুন, শুনুন সামনে-বসা যাত্রীদের বাক্যালাপ, ঝগড়া, প্রেম-বিনিময়। আর লিখে যান কবিতা। '...অমুক কাগজে আমি কবিতার সম্পাদক...'। প্রকাশিত হল 'আবার পুরী সিরিজ'— কফি হাউসে একদিন নিয়ে এলেন সেই বই। একেবারে কাকতালীয় ভাবেই আমরা দেখলাম সেই গ্রন্থের মলাটের রঙ আর কফি হাউসের দেওয়ালের রঙ মিলে-মিশে একাকার।

সেই সময় থেকে আজও এই কবিকে পাওয়া যায় তরুণতর কবিদের মাঝে, কফি হাউসে। কখনও কোনো নতুন কবির কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করছেন, আবিষ্কার করছেন কোনো কৃশকায় গ্রন্থের মৃদু স্বভাবের মহিলা কবিকে আবার কখনও কোনো প্রখর বুদ্ধিজীবীর প্রত্যেকটি মতামতের জ্বালাময়ী বিরোধিতা করছেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। দু'হাত ভরে না হলেও লিখেছেন গল্প, পুস্তক-পর্যালোচনা, গোয়েন্দা কাহিনী, কবিতার বই-আলোচনা, টি. ভি. বা রেডিয়োর অনুষ্ঠানের ভালো লাগা, খারাপ লাগা, বইয়ের ব্লার্ব, বিজ্ঞাপনের কপি। সব লেখাতেই আছে প্রচ্ছন্ন মজা, বুদ্ধিদীপ্ত কথা আর চুলচেরা চালাকি ধরে-ফেলা বিশ্লেষণ। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, যত্নে তুলে রাখার মতো স্ক্রিপ্ট তাঁর— এমনকি কাটাকুটির অংশটুকুও।

'কখনও আদেশপ্রাপ্ত হয়ে লিখেছেন কবিতা?'

উত্তরে জানিয়েছেন, 'হ্যাঁ তাও লিখতে হয়েছে বৈকি! একবার শ্যামল, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'অমৃতে'র কবিতা দিতে দেরি হয়েছে বলে আদেশ দিলেন 'কালকেই তোমার কবিতা চাই'। ব্যাস, আর কোনো কথা না বলে হাত-পা ধুয়ে কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসে গেলাম। লিখলাম কবিতা।

আর একবার শম্ভু, শম্ভু রক্ষিতের আদেশ ছিল অভিনব— একটা সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ আর কলম দিয়ে সেদিন এক দূরের টেবিলে আমাকে বসিয়ে দিয়ে শম্ভু চলে গেল এই বলে, '...আধঘণ্টা সময়। আমি ফিরে আসছি। 'মহাপৃথিবী'র জন্য একটা কবিতা যেন রেডি থাকে'। আদেশ শিরোধার্য করে বসে গেলাম। ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে লিখে উঠলাম 'বৌভাত'—'ঘুম আর বোঝাপড়ার মাঝখানে ধনিবহুল ধানক্ষেৎ সংগীতময় সরীসৃপ। আর দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কতদূর...'

১৯৭৮-এ 'আবার পুরী সিরিজ'-এর প্রকাশের পর থেকেই উৎপল বলতে শুরু করলেন, '...কবিতার বই এবার হোক এক ফর্মা, দেড় ফর্মা বা বড় জোর দু' ফর্মার। আসল ব্যাপার হ'ল কতগুলো কবিতা আছে তা নয়, কবিতাগুলো কীভাবে পরিকল্পনা-মাফিক নিখুঁত

সাজানো হ'ল—এটাই চিন্তার'।

তরুণ কবিদের সেইসময় প্রচুর কাব্যগ্রন্থ বেরুতে লাগল ঐভাবে— এক ফর্মার বা দুই ফর্মার।

ভেতরে ভেতরে আসলে তিনি নিজেও তাঁর ঐরকম বইয়ের কথা ভাবছিলেন হয়ত। হঠাৎ একদিন কফি হাউসে প্রস্তাব রাখলাম তাঁর কাছে, 'আপনারও এক ফর্মার একটি কবিতার বই হোক'। যেই কথা, সেই কাজ। 'প্রতিবিম্ব' থেকেই তাহলে প্রকাশিত হোক সে বই। প্রকাশক : আপনি আর পার্থ', পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল'—বললেন উৎপল। পার্থ সব শুনে তাঁর চিরাচরিত মুচকি হাসি হাসেন আর আমাকে ঠেলে দেন সেই প্রকাশনার দায়িত্বে, অর্থাৎ 'বুঝুন এবার…'। ঠেলা অবশ্য আমায় প্রচুর সামলাতে হয়েছে। কেন না লেখক হলেন উৎপলকুমার বসু আর ছাপাখানা হল 'কৃত্তিবাস'-খ্যাত প্রয়াত গনেশচাঁদ দে-র তরুণ প্রেস। ভালো কবি বা লেখকদের প্রকাশনা বিষয়ে যে ওস্তাদি থাকে, তা আর একবার প্রত্যক্ষভাবে দেখলাম। কবিতা তো তাঁর সাজানোই ছিল, স্ক্রিপ্ট, একেবারে ছাপার অক্ষরে, টায় টায় এক ফর্মার, একটি অক্ষর বেশি নয়, কম নয়। কাগজ, ছাপার টাইপ, মলাট? উৎপল আর আমি দু'জনে গেলাম পান্নালাল শীলের দোকানে। খুঁজে খুঁজে বের করি, পছন্দ করি এক অসাধারণ ফুরফুরে, সাদা কাগজ (ব্রাজিলিয়ান নিউজপ্রিন্ট) মলাটের জন্য বিস্কুট রঙের ক্রোকোডাইল কভার। পান্নালাল শীল, অতি যত্নে, লোক লাগিয়ে, গুদাম থেকে বের করে দিলেন ঐ দুষ্প্রাপ্য কাগজ। উৎপলকুমার বসুর জন্য জলের দর। উৎপলের সঙ্গে পান্নালালের কাগজের কোয়ালিটি এবং নান্দনিকতা নিয়ে আলোচনা যথার্থই মিস্টিক। কাগজ নিলাম এক ফর্মার, সম্ভবত ৫০০ কপির জন্য। এক টাকা দামের 'লোচনদাস কারিগর' ছাপা হয়ে গেল। বইটি শেষ হয়েছিল 'সপ্তর্ষি' কবিতা দিয়ে, যাতে ঘুমের আহ্বান ছিল। বই ছাপা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে প্রেসের কর্মচারী এবং আমাদেরও যেন ঘুম এসে পাড়া জুড়োলো। …'গভীর উদ্বেগ নিয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায় / সাতখানি ঘুম / আমাকে রয়েছে ঘিরে /… বলে : আয় / গভীর উদ্বেগ থেকে / ভয়াবহ সুষুপ্তির দিকে'।

ভয়াবহ সুষুপ্তি? তা ইতো। মলাট কই, মলাট? কে আঁকবে ঐ ভয়ঙ্কর কাব্যগ্রন্থের মলাট?' সেই মলাটকে তো হতে হবে আরও ভয়াবহ। এখুনি তা হবে কী করে? হবে-হবে করে হয়েও গেল সেই মলাট। যাঁদের 'লোচনদাস কারিগর'-এর মলাটের কথা এখনও মনে আছে, তাঁদের অবগতির জন্য জানাই কত-না-সহজে আমরা তৈরি করে-ছিলাম সেই উল্টে-যাওয়া বটগাছ, চেয়ার, ঘড়ি, হরিণ বা টিয়াপাখির ছবি। সাজানো হয়েছিল উৎপলের কবিতার মেজাজকে হুবহু ধরে। তরুণ প্রেস সে সময় প্রায় উঠে যায় আর কি, গনেশচাঁদ দে-র বড় টেবিলের দু'দিকে বসে আমরা। বস্তা করে আগেকার দিনের ছোট ছোট দস্তা বা তামার তৈরি ব্লকগুলো (যা অতীতে প্রায়ই ব্যবহার হত লেখার শেষে সমাপ্তির প্রতীক হিসাবে) বিক্রি হতে চলেছে সের দরে। তাদের

প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। উৎপল ধরলেন সেই বস্তা-মাথায় লোককে। বের করা হল টেবিলের উপর এক একটি ব্লক, রাখতে গিয়ে কিছু উল্টেপাল্টে গেল বা পাশাপাশি রাখা হল। ঐ হয়ে গেল মলাট। চান্স-ফ্যাক্টরকে মর্যাদা দিন— উনি জানালেন। পিছনের পাতাও অনুরূপ। মাছ, পশু, জলে ভাসা জাহাজ বা ধূর্তি পরিহিত নাদুস-নুদুস বালকের মাঝে থাকল অবিস্মরণীয় রার্ব' (উৎপল যাকে বললেন 'প্রগল্‌ভতা') 'ঝাঁকাও যে ডাল ইচ্ছে / গাছ তার চেনা ফলগুলি / উপহার দিতে থাকে / আমরা লাফিয়ে উঠি / দৌড়ে যাই'…

এইভাবে, ৮২-র মার্চে প্রতিবিম্ব প্রকাশনী, বৈশাখী, ডি ১৩/৫, সল্টলেক থেকে প্রকাশিত হল 'লোচনদাস কারিগর'। তার প্রকাশের টাকা কোথা থেকে এল আজ মনে নেই এবং এখন সে-বইয়ের একটি কপিও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিগত সংগ্রহে মলিন হয়ে যাওয়া একটি কপি সেদিন এক তরুণ কবিকে দিতে পারায় তিনি জানালেন, 'এটি আমার কাছে এই শতাব্দীর সেরা উপহার'। তিনি বাড়িয়ে বলেছিলেন কিনা জানি না, তবে তাঁর অনেকদিন ধরে ঐ বই খোঁজার তাড়না দেখে আমারও অনুরূপ মনে হয়েছিল।

ঠিক চারবছর পর আবার আরেক এক ফর্মার কবিতার বই। 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন'। প্রকাশকের জায়গায় আবার আমার আর পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের নাম। সেই পান্নালাল শীলের দোকানে ছুটে যাওয়া। খুঁজে পাওয়া গেল পুরনো দিনের ডায়েরি ছাপার অ্যান্টিক-জাতীয় কাগজ। এবার আর মলাটের রিস্ক নেওয়া হয়নি। উৎপলেরই নিজের তৈরি ডিজাইন। প্রথম মলাটে লাল খেরোর খাতার রঙের মাঝে কালোতে 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন', পিছনটা গাঢ় কালো, যেন অন্ধকার। দু' টাকা দামের 'প্রতিবিম্ব প্রকাশনী'র ঐ কাব্যগ্রন্থ বেরুল ১৯৮৬-তে, ঐ একই ঠিকানা থেকে, যা ছিল আমার একসময়ের ছোট্ট ডেরা। আগের বই শেষ হয়েছিল ঘুম দিয়ে এবার শেষ হল জঙ্গলে ওড়া, বোতল আর গেলাস ভাঙা দিয়ে। …'সমস্ত পাহাড় আজ চুপ/সব ঝর্ণা স্থির হয়ে আছে/প্রতিধ্বনি— গেলাস ভাঙছে/জঙ্গলে উড়ছে বোতল'।

পাওয়া যায় না এই বইটিও, কিন্তু মাঝে মাঝে বড় মুশকিলে পড়ি আমি। ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসার এতদিন পরেও, অসহায় আমার কাছে সে বাড়ির বর্তমান ভাড়াটে সহৃদয় হয়ে মাঝে মাঝে দু' একটি মলিন হস্তাক্ষরের ১ টাকা বা ২ টাকার মানিঅর্ডার দিয়ে যান, যাতে থাকে, সুদূরে কোনো গঞ্জের বা জেলার কোনো এক তরুণ কবির আর্ত আর্জি, "এক কপি 'লোচনদাস' বা 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন' পাঠালে খুশি হব।"

'কবিতা, আমরা জানি, কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়। কবিতা পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টিকারী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকেন্দ্রিক চরিত্রের জন্য কবিতায় ব্যাকরণ, শৈলী এবং নম্বরতা তৈরী হয়েছে। অপরদিকে প্রতিক্রিয়ার জন্মদাত্রী বলে কবিতায় প্রাণ আরোপিত হয়।' একেবারে সাম্প্রতিককালে উৎপলের দেওয়া কবিতার এই সংজ্ঞাকে

রেখে যদি আমরা জানতে চাই উৎপলের কবিতার প্রতিক্রিয়া পাঠকের কাছে কেমন এবং এককথায় যদি তার উত্তর দিতে হয়, তা হলে বলতে হয়, 'তীব্র'।

একসময় এমন হয়েছিল যে কথাবার্তায়, টেলিফোনে, অফিসে, বাজারে তরুণ কবিরা উৎপলের কবিতার ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বরানগর বাজারে আমি আর কবি দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাচ্ছি এক হোমিওপ্যাথের কাছে, দেবপ্রসাদের প্রবাদ-প্রতিম পেটখারাপ তখন চরমে। সব ছেড়ে তাই হোমিওপ্যাথি। দেখা ভাস্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি সব শুনে দেবপ্রসাদকে দেখে বলে উঠলেন 'প্রিয়তমা, তোমার দু'খানি চোখ হোমিওপ্যাথির মতো করুণা-নির্ভর'। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হল 'প্রতিবিম্ব'র জন্য— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি সাক্ষাৎকারী। সাক্ষাৎকারটি লেখার পর তার শিরোনাম দেওয়া হল 'চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' দেবপ্রসাদ প্রস্তাব দিলেন তার নিচে দশ পয়েন্ট-এ লেখা হোক— 'অপরাহ্নে পাতা হল আরও বেশি চা-টেবিল বনের ছায়ায়'। বা কোনো তরুণ কবির কবিতা পড়ে আর তত তরুণ নন, এমন কবিরা একসময় মন্তব্য করতেন, 'হ্যাঁ, তোমার কবিতাগুলি/পড়েছিলাম ...কবিতাগুলি বাংলা অক্ষরে...' পাগল প্যান, আমাকে করো লাজুক'/টেলিফোনে উৎপলকেও একসময় নিয়মিত শুনতে হয়েছে কোনো জায়গায় তাঁর যাবার সম্মতি নিতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে— 'কী করছ রাধা, তুমি/আসছ না— না আসছ ?' একজন কবির জীবদ্দশাতেই কবিতার এরকম স্মরণযোগ্যতা বাংলা কবিতায় খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না।

'আপনার কী মনে হয়— একজন কবির সাফল্য কোথায় ?'—এই তো সেদিন এক তরুণের জিজ্ঞাসায় নিজের প্রসঙ্গ চেপে গিয়ে উৎপল বলে উঠলেন, 'যদি দেখা যায় সেই কবি এক স্কুলের জন্মদাতা— যে স্কুলের পড়ুয়া হয়েছে আরও একদল তরুণতম কবি, আরেক প্রজন্ম, কবির সাফল্য সেখানে, অন্তত আমার তো এরকমই মনে হয়।'

এভাবেই উৎপল আজও বাংলা কবিতার অগ্রবর্তী অংশে বিশাল জায়গা জুড়ে বসে আছেন তাঁর কবিতায় ও গদ্যের দেশজ সম্ভার নিয়ে। হ্যাঁ, দেশজ সম্ভার— তাঁর কবিতার শরীর জুড়ে বিদ্যমান। জীবনানন্দকে রূপসী বাংলার কবি বললে পাশাপাশি উৎপলের কবিতাকেও সেই বাংলারই ছায়ায় নিয়ে আসতে হয়। লন্ডনে বসে লিখেছেন 'নরখাদক'-এর মতো গল্প, দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকেও একটি কবিতাতেও বিদেশবাসের প্রসঙ্গ আসেনি। দেশে ফিরেই যে-কবিতা লিখেছেন তাতে এসেছে উত্তর চব্বিশ পরগণার হাত-পাখা বা '... যদি প্রাণ, যদি হে রসিক / নৌকায় ঠেলা দিয়ে বলো / দু'টো দিন, বেয়াই মশাই / দু'টো দিন থেকে গেলে হত'। বা 'টমাটো— তুবড়ি-লাল, আমি সিকি-আধুলির মতো গড়িয়ে পড়ছি / চিতল— ধারালো মাছ, খ্যাপা টান দু' দশটাকার'। শিকড় ছড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের মাটিতে, মন যার ব্যস্ত 'সই লুডো খেলায়', যিনি দেখে যেতে চান অবিরত 'প্রতিটি ফার্নিচারের পিছনে যে-গাছ আতা দোলায় তার নিসর্গ' বা 'টায়ারের ভিতরে কি উপায়ে মদ চালান হয়। কিভাবে ইলেকট্রিক ট্রেনের গোড়ালির কাছে লুকিয়ে রাখা

হয় গোবিন্দভোগ ··· ।' যাঁর সংসার পাতা প্রকৃতির হেঁসেলে, 'মাটির অল্প নিচে রাঙা আলু, প্রকৃতিতে যথার্থ হেঁসেল, উপরে আগুন, নুনজল বাতাসে ফুটছে', সেই কবির দেশের বাড়ি যে কোচবিহার, সার : দিনহাটা, এ বিষয়ে আর সন্দেহই থাকল না, না হলে এ-সম্বোধন কাউকে কোনোদিন করা যায় না '··· আমাদের দেশে এবার চাষবাস ভালো হ'ল— শাকশব্জী উঠেছে প্রচুর। পুকুরে নরম মাছ— হাঁসের নতুন ডিম— রিক্সায় / যদি-বা আসো চার আনায় পৌঁছে দেবে ওরা ।'

উৎপলের জীবিকা ঘর-সংসারের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে এ লেখা শেষ করা যাবে না। যদিও তার সঙ্গে সেদিন সারা সন্ধে 'কবিতা' নিয়ে যে-কথা হল তার কোনো সম্পর্ক নেই। আবার অন্যদিকে হয়ত বলা যায় একটা 'গোপন আঁতাত' নিশ্চয় আছে। প্রবাসী উৎপল এদেশে ফিরে যে-জীবিকা গ্রহণ করেছেন তা কিন্তু কবিতা লেখারই আর এক পিঠ। কাজটি হল কমিউনিকেশনের। মানুষের সঙ্গে মানুষের ছবির, গানের কথার, স্থির চিত্রের, চলচ্চিত্রের। এই সূত্রে আমার সঙ্গে উৎপলের দীর্ঘদিনের কর্মযোগ। গ্রামে, শহরে, সভায়, সেমিনারে, কর্মশালায় আমরা একসঙ্গে বহুবার গেছি। সহজ, সরল ভাষায় তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষ বা মা-শিশুদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের অভিপ্রেত-বার্তা যেভাবে পৌঁছে দিয়েছেন তার তুলনা নেই। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রজন্মের 'সিলেবাস' উনি তৈরি করে দিয়েছিলেন— সংযোগের ভাষা, পদ্ধতি, সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে।

একবার এক কর্মশালায় গেছি— জলপাইগুড়িতে। কর্মশালার বিষয় ছিল তৃণমূল-স্তরের মহিলা কর্মীদের, তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা, সহজ ও সরল ভাষার আরো বেশি-মাত্রায় লিখতে শেখানো। 'কীভাবে লিখতে হবে'— এই ছিল বিশেষজ্ঞ হিসাবে উৎপলের বক্তব্য। তাঁর বক্তব্য কর্মীদের এমন উদ্বুদ্ধ করল যে তারপর গ্রাম থেকে আসা সেইসব শিশুদের-নিয়ে-কাজ-করা মহিলা কর্মীদের লেখার বন্যায় আমরা ভেসে গিয়েছিলাম। আমাদের প্রকল্পের 'চোখের আলোয়' পত্রিকাটিতে সে সব অনেক ছাপা হয়েছে। কর্মশালা শেষে আমরা গেছি চা-বাগানে। ফেরার পথে ময়নাগুড়ির বাজারে চা খেতে নামলাম গাড়ি থেকে। আমরা চা খাচ্ছি, উৎপল চা না খেয়ে বাজারে এক ঝাঁকা কমলালেবু নিয়ে বসা ছেলেটির দিকে এগিয়ে যান ?' 'লেবু কত করে জোড়া'— ছেলেটির দেওয়া উত্তরে আমাদের মাথায় হাত। এখানেও, এই শীতকালে লেবুর দাম এত ? হঠাৎ উৎপল বলে ওঠেন, 'লেবুর হালি কত করে ?' এবার যে উত্তর আসে, তাতে আমরা আশ্বস্ত হই। লেবু বিক্রেতার কাছে 'জোড়া'র চেয়ে ('হালি' অর্থাৎ) চারটি অনেক বেশি কমিউনিকেটিভ। তাই এবার সে সঠিক দাম বলেছে।

স্টেটস্‌ম্যান এক-দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে, আমরা যে কাজের সঙ্গে চাকরিসূত্রে জড়িত সেই প্রকল্প নিয়ে এক পাতার ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হবে। বাংলা লেখাগুলো দপ্তরের অনেকেই ইংরেজিতে অনুবাদ করলাম। উৎপল বেছে নিলেন একটি দুর্বল এবং ভাষাজটিল লেখা—গ্রামের এক মায়ের নিবেদন। স্টেটস্‌ম্যানে ছাপা হয়ে যেদিন লেখা-

গুলো বেরুল, আমরা দেখলাম সব লেখাগুলোতেই তাঁদের বিভাগীয় সম্পাদকের হাতের প্রবল ছোঁয়া। কেবলমাত্র উৎপলের নিখুঁত ও বিস্ময়কর অনুবাদের একটি দাঁড়ি বা কমাও তাঁরা ছুঁতে সাহস পাননি।

আর এই কবির ঘর গেরস্থালি? তা-ও নিখুঁত। এই তো সেদিন সকালে আড্ডা মারতে গেছি উৎপলের বাড়িতে। ড. ভূমেন্দ্র গুহ এসেছিলেন। হঠাৎই আমাকে বললেন ওঁর লেখার টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারগুলো টেনে দেখতে। প্রত্যেকটি খাপ ছবির মতন সাজানো। কোনো খাপে খাম, কোনোটিতে কলম, আলপিন, ইরেজার, পেন্সিল, ক্লিপ ইত্যাদি ইত্যাদি... সব সাজানো, চাইলেই, খোঁজাখুঁজি তো দূরের কথা, সহজেই তুলে নেওয়া যাবে। উৎপলের লেখার ঘর থেকে অফিস ঘর, বসার ঘর থেকে তাঁর হাতের নোটবুকটি, কলম থেকে শুরু করে বাড়ির চাবির রিংটি পর্যন্ত পরিপাটি হয়ে থাকে তাঁর কাছে। এরকম শৃঙ্খলার মাঝে থেকে কী করে উৎপল ঐসব স্বপ্নবাস্তবতার লেখা লিখে ওঠেন, তাই কেবল ভাবতে হয়। ভূমেনবাবু বলছিলেন, 'স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক চমৎকার, ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর। এই দেখুন না, এখনি কফি আর পাকোড়া আসবে। কবির ঘর-গেরস্থালির এমন সুন্দর নমুনা আর পাবে নাকো তুমি'। বেলা গড়িয়ে দুপুর।

একুশ শতাব্দীর কবি উৎপলকুমার বসু তখন মিটিমিটি হাসছিলেন। খাওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আসলে ভূমেনের খিদে পেয়েছে। চাইছে এই ভরদুপুরে মাছের মুড়ো রুপোর বাটিতে, পঞ্চ ব্যঞ্জন, কাপড়ের ঝালর-দেওয়া হাত-পাখা নিয়ে সামনে কেউ বসে হাওয়া করুক।'

আগামী শতাব্দী থেকে আমরা আর মাত্র কয়েক বছর পিছিয়ে। ধূমপান পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। নিজে গাড়ি ড্রাইভ করেন কখনো-সখনো। পার্ক সার্কাসের মোড়ে ক'বছর আগে বাসে একবার চোখে অন্ধকার দেখলেও আড্ডা মারছেন নিত্যদিন। হৃদযন্ত্র অল্প বিকল। ক্লাবে যাচ্ছেন যখন ইচ্ছে। একবার কেবল গভীর রাতে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুঁজে পাননি। তাতে কী যায় বা আসে?

মাঝে মাঝে এখনও তাঁর রাগ হয়। আর রেগেমেগে কখনো-সখনো বলে ওঠেন 'অমুক বাবু যখনই কোনো বক্তব্য রাখেন, তা সে ঠিক/বেঠিক যাই হোক, আমার কাজ হবে বিরোধিতা করা— এই এক ব্যামো হয়েছে আমার আজকাল'। আজও এই বয়সে কফি হাউসে মস্করা, ফিচ্‌লেমিতে তুখোড় উৎপল চির-তরুণের হাসিতে ফেটে পড়েন। অপুরস্কৃত এই কবি তাঁর নবীন পাঠক-পাঠিকাদের ভয় দেখান "...আমার কবিতা পড়বেন না, পড়লেই বিপদ— ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, মৃত্যু। এই দেখুন না, শামশের চলে গেল। কত রাতে, কত সন্ধ্যা, কত গল্প শামশেরের সঙ্গে! ওর কফিনটা যখন বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে, যদিও সেই ভয়ংকর দৃশ্যে উপস্থিত থাকিনি ইচ্ছে করেই— ওর বাড়ির লোকদেরই মতো আমারও বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, 'যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা কোরো, শামসের'। ... চলে গেল শংকর চট্টোপাধ্যায়,

তুষার রায়, সুব্রত চক্রবর্তী, অলকেশ ভট্টাচার্য, দীপক মজুমদার, মানিক চক্রবর্তী, অনন্য রায়, ফাল্গুনী রায়…"

হঠাৎ হাসতে হাসতে বলে ওঠেন : 'দুই বাংলা যদি কখনও এক হয়ে যায়— আমার সবার কাছে বিনীত প্রস্তাব রইল— সেই জুড়ে-যাওয়া নতুন দেশের রাজধানী হোক নতুন জায়গায়, গ্রীষ্মে পুরুলিয়া আর শীতে দার্জিলিং।

'আপনার নিজের লেখা সম্পর্কে এই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া কী?'— আমার লেখা হল পুরনো বাড়ির সেই বড় জেঠি, যিনি অষ্টমীর দিন সন্ধেয়, সারা বছর পর, বাইরে বেরিয়েছেন, ঠাকুর দেখতে। ছেলেপুলে, নাতি-নাতনিদের খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, সংসারের কাজকর্ম সেরে, সেজেগুজে বেরিয়েছেন। আমার কাব্যগ্রন্থই বলুন আর গদ্যগ্রন্থই বলুন— সব যেন ঐ কপালে বড় টিপ, এক-গা গয়নায় ভর্তি সাজাগোজা বড় জেঠি। সেই জবাকুসুম, কান্তা সেন্ট, হেজলিন স্নো, ওটীন ক্রিম— সব মিলিয়ে এক মেট্রো প্যাটার্ন!'

'— আপনাকে কেউ যদি বলেন একটা বাণী লিখে দিন বা এপিটাফ্, কী লিখবেন উৎপল-দা?'

একমুহূর্ত না ভেবে তাঁর ঝটিতি উত্তর, 'টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও'।' □